সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুভাষচন্দ্রের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব	১১
সুভাষচন্দ্রের জীবনে রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব	৩৮
সুভাষচন্দ্র ও জাতীয় সংহতি	৪৪
সুভাষচন্দ্রের জীবনে কাব্য ও সঙ্গীতের প্রভাব	৫৫
গানের জগতে আত্মমগ্ন সুভাষচন্দ্র	৬৮
সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ	৭৬
যোগী-দৃষ্টিতে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র	৯৭
শিখ ইতিহাস ও চিন্তাদর্শনের আলোকে সুভাষচন্দ্র	১১০
ত্রিপুরী কংগ্রেস	১২৭

সুভাষচন্দ্রের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা রাজনীতির ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর চিন্তা মানবমুক্তির বৃহত্তর লীলাভূমিতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তিনি মানুষের মনোজগতের বৈপ্লবিক রূপান্তর কামনা করেছিলেন যার দ্বারা তার দৃষ্টি সংকীর্ণ থেকে বৃহতের দিকে প্রসারিত হবে। বাংলার বিপ্লবীসমাজ সম্পর্কে ররীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেক বিপ্লবীর দ্বারা সমালোচিত হয়েছে, বিশেষত তাঁর 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাস দুটিতে বিপ্লবীদের যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ এক সাক্ষাতকারে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে বলেছিলেন যে উপরোক্ত উপন্যাস দুটি জাতীয় আন্দোলনের প্রচুর ক্ষতি করেছে। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবচিন্তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলার বিপ্লবীসমাজের প্রতি কোন জাতক্রোধ পোষণ করতেন এমন ভাবার কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের মনে বিপ্লবীসমাজের প্রতি একধরনের দ্বিধামিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রচলিত অর্থে Patriotism বা দেশপ্রেমের চেয়ে অনেক বৃহৎ আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে বিপ্লবীসমাজ বিপথগামী হতে বাধ্য। আশ্চর্যের কথা এই যে 'চার অধ্যায়' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বৃটিশসরকারের কৃতজ্ঞতাভাজন করে তোলেনি। একটি গোপন নথিতে লেখা হয়েছিল। 'he is now more rabidly anti Government than he ever was in the past, a very recent source report from Calcutta alleges that this is apparent in the novel which he has recently published'. আসলে রবীন্দ্রনাথ গুপ্তহত্যা বা বিছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে

অনুমোদন করেন নি কারণ তিনি জানতেন যে এর দ্বারা দেশমুক্তির প্রয়াস বাতুলোচিত। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে তিনি অহিংসার দ্বারা দেশ স্বাধীন করার কথা কখনো ভাবেন নি। তবে যেহেতু তিনি বিশ্বকবি তাই সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস কথাও তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না কারণ তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। জীবনের শেষ লগ্নে কিন্তু তিনি দেশনায়কের বরমাল্য অর্পণ করলেন এমন একজনকে যিনি কোনদিন অহিংসায় বিশ্বাস করতেন না এবং অন্তরের গভীরে বৃটিশসাম্রাজ্যবাদকে সম্মুখসমরে পর্যুদস্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি প্রথমে রবীন্দ্রনাথ তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। নানা কারণে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিল এবং তার ফলে দীর্ঘসময় রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন। ১৯৩৯-৪০ রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কে এক নূতন অধ্যায়ের সূচকস্বরূপ। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ মুছে ফেলে তাঁকে দেশনায়কের পদে বরণ করলেন। 'দেশনায়ক' শিরোনামে যে ভাষণটি তিনি রচনা করেন, সেখানে তিনি লেখেন 'তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট'। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই বৃহত্তর বিপ্লবের পূজারীকে, যাঁকে কোন দুঃখকষ্টই অভিভূত করতে পারেনি, তাঁর 'চিত্তকে করেছে প্রসারিত', দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে 'দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে।'

বাঙলার বিপ্লবী সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কেমন ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপরোক্ত ভাষণটি। তিনি বলেছেন 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্ত্তী প্রজন্মের তরুণদের চিত্তে দেখেছি ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্য আলো নিয়েই জন্মেছিল-ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিস্ফলতায় ভগ্নসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে'। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন সেই অনাগতদিনের দেশনায়ককে যিনি শুধু দেশমুক্তি নয়, মানবমুক্তির প্রশ্নটিকেও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির (Total freedom) দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবমুক্তির চিন্তার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ১৫। ১২। ২৯ অমরাবতী বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেন 'What we want, is an awakening from within, which will bring about a radical transformation of our life. What is wanted is a transfiguration of

our whole life, a complete revolution if you will'. এখানে যেন শ্রী অরবিন্দের প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়। রবীন্দ্রনাথও মানুষের আত্মিক জাগরণের কথা ভেবেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে রবীন্দ্রনাথের এত বিলম্ব হল কেন? এই প্রবন্ধে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। প্রবন্ধকার একটি কৌতূহল নিয়ে শুরু করতে চান যে জীবনের শেষ লগ্নে কি রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবচিন্তার কোন রূপান্তর ঘটেছিল এবং তা কি ছিল সুভাষ সম্পর্কে তাঁর নবমূল্যায়নের ফলশ্রুতি?

প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তা ছিলেন না, তবে তিনি পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক বাস্তবকে অস্বীকারও করেননি। ১৯২০ সালের ৬ নভেম্বর, রোদেনস্টাইনকে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "Politics is now a mere abstraction. I cannot say to myself, 'poet you have nothing to do with these facts which belong to politics'." পরাধীনতার গ্লানিকে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন এবং সেইজন্য রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ভূমিকায় (Interventionist role) অবতীর্ণ না হয়েও তিনি নিজের রঙ্গমঞ্চে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। যদিও ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে (Controlling force) রবীন্দ্রনাথ কখনোই আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রভাবশালী ভূমিকা (Influential role) একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গানে গানে সমগ্র বাংলাকে মাতিয়ে তুলে নব চেতনার জোয়ার এনেছিলেন। রাখীবন্ধন উৎসবের প্রবর্তক হিসাবে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয় ছিল। এরপরে কিন্তু দীর্ঘ সময় রবীন্দ্রনাথ দলীয় রাজনীতির জগৎ থেকে দূরে সরে যান এবং ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগৎ থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। যদিও রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি সর্বদাই নিজের অকপট মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং চিন্তাভাবনার দিক থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধূসর জীবনের গোধূলিবেলায় আবার রবীন্দ্রনাথ দেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং এক নতুন বিপ্লব চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন এক রূপান্তরিত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবচিন্তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতির চিন্তা কোন্ পথ অনুসরণ করেছিল? দ্বিতীয়ত, বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? তৃতীয়ত, জীবনসায়াহ্নে কি রবীন্দ্রনাথের বিপ্লব চিন্তায় কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল? সেই নতুন রবীন্দ্রনাথ কি পুরাতন রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি? সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার প্রবহমান স্রোতের মধ্যে কি নিরবচ্ছিন্নতার অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয় নাকি তার সমগ্র রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে আদ্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় ছিল? মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে

একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের ঘেরাটোপের মধ্যে বিচার করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ ও তথ্যবিকৃতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। রবীন্দ্রনাথকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে দলীয় চিন্তাধারার (Party Line) অনেক উর্ধ্বে যেতে হবে এবং দলীয় মতকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্ধসত্য ও অসত্য ভাষণের সর্বনাশা প্রবণতাকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। হতে হবে মুক্তমনা সত্যান্বেষী যার একমাত্র লক্ষ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার অবলুপ্তি।

১. রাজনীতির জগতের দূরের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগৎ থেকে দূরে সরে যান। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে যতই অগ্রসর হন না কেন, রবীন্দ্রনাথ মূলত ক্রান্তদর্শী কবি। তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় অনেক বৃহৎ ও প্রসারিত ছিল। সেই কারণেই তিনি অ্যান্ডরুজকে লিখেছিলেন, " It cannot be said that I am untouched by Swadeshi and Swarajism, but I am incapable of accepting them as final. They claim from us, more then what is due. The complete man must not be sacrificed to the political man."– এ থেকে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপুল তরঙ্গের অভিঘাত যদিও রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে মথিত করেছিল, তবু সামগ্রিক বিচারে ও বৃহত্তর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির প্রশ্নটি তাঁর কাছে ছিল গৌণ। রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব রচনার একটি বড়ো কারণ হল এই সময় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের উপরে আন্তর্জাতিকতাবাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার তুলনায় মানবমুক্তির বৃহত্তর প্রশ্নটি তাঁর সমগ্র মনোজগৎকে অধিকার করে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর প্রত্যয়জাত উপলব্ধি যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্তরে সম্ভব নয়। তার জন্য সামাজিক স্তরেও ব্যাপক প্রয়াস ও উদ্যোগ আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে রাষ্ট্রশক্তির উপরে সমাজশক্তিকে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আত্মশক্তির উন্মোচন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি এই সময় গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং স্বদেশী সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এপ্রসঙ্গে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ অসহযোগের বিপক্ষে ছিলেন না, কিন্তু পরের দিকে কয়েকজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। অবশ্য গান্ধীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে কোনো মনান্তর তাঁর কখনোই হয় নি কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ এই সময় তীব্র আকার ধারণ করে। এই বিরোধের

কারণ অনুধাবন করতে গেলে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে 'জাতীয়তাবাদ' শিরোনামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন যেখানে তিনি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদকে তীব্র কশাঘাত করেন। পশ্চিমের যান্ত্রিক ও ক্ষমতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানত হিংসাশ্রয়ী, জড়বাদী ও সংঘাতসর্বস্ব। জাতি রাষ্ট্রের যৌক্তিকতাকে নাকচ করে তিনি বলেন যে এর দ্বারা রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকৃত হয় কিন্তু সমাজ হয় উপেক্ষিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই প্রশ্ন তোলেন, "But what are these products of the nation–the machinery of destruction and profit-making, the double dealing of diplomacy?" রবীন্দ্রনাথ এক অখন্ড ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও তিনি প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যের সভ্যতার উৎকর্ষকে স্বীকার করেছিলেন, তবুই একই সঙ্গে অতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিও বজায় রেখেছিলেন। প্রাচ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেনতার ফলে প্রতীত্যের ইতিবাচক দিকটি গ্রহণ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ রচনার স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়েছিলেন এবং একথাও বলেন যে, "India would be deprived of her fulness if shorn of the western contact." এইখানেই ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সেতুর প্রতীক ছিল তাঁর বিশ্বভারতী। কিন্তু দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালের ২১ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেন। তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকায় যতীন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতি কটাক্ষ করে লেখেন, 'ভারত এক্ষণে ঘোর দুর্দশাপঙ্কে নিমগ্ন। বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বভারতীর কথা এক্ষণে তাহার ভাল লাগিবে কি?"

১৯২১ সালের ১৫ আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৮-এর অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ করেন। চিত্তরঞ্জন ১৯২১ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসের ৩৭ তম বার্ষিক অধিবেশনেও ররীন্দ্রনাথের প্রতি সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেন। অবশ্য চিত্তরঞ্জনের রবীন্দ্রনাথ-বিরোধিতার সবটুকুই যে ব্যক্তিগত শ্লেষ ও বিরূপতা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, সে কথা বলা যায় না। গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি ভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইউরোপের জাতীয়তাবাদকে সমার্থক জ্ঞান করা অযৌক্তিক। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল স্বরাজ অর্জন করা। অরবিন্দ পোদ্দার যথার্থই বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের যুক্তি কাঠামোর যে অংশ দুর্বলতম, সেখানে চিত্তরঞ্জন অপ্রতিরোধ্য। কেননা রবীন্দ্রনাথ এ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছেন যে গুণগত বিচারে একটি পরাধীন

ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয়তাবাদ, দখলদার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের জাতীয়তাবাদ হল সেই হিংস্র দানব যার তাণ্ডবের চিত্র তিনি ন্যাশনালিজম গ্রন্থে এঁকেছেন যার অন্য নাম আগ্রাসন, লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস। পক্ষান্তরে পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ উদ্‌বোধন ঘটে ওই দানবকে প্রতিরোধ করা এবং এর নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় আত্মমর্যাদাকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংকল্প থেকে। সুতরাং এর একটা সৃষ্টিশীল গঠনমূলক ভূমিকা স্বীকৃত— এর লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু একে আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলোর জাতীয়তাবাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গন্য করা এবং প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করার অর্থ বিভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করা এবং প্রকারান্তরে আত্ম-অবমাননাকে মেনে নেওয়া। এই মনোভঙ্গি অজ্ঞাতসারে ওই দানবের আধিপত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার সহায়ক হয়।"

আমেদাবাদ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের যে ভাষণটি তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করা হয় সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে জয়যুক্ত হতে হবে অন্যান্য জাতির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের কি আতিথেয়তা বোধের এতই অভাব যে আমরা তাকে স্বাগতম বলে আহ্বান জানাব না?' রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের যথার্থ্য স্বীকার করেও চিত্তরঞ্জন বলেন, "কোন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর পূর্বে আমাদের নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আত্তীকরণের পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মআবিষ্কার করতে হবে। আমার সুস্পষ্ট অভিমত স্বাধীনতা ভিন্ন যথার্থ আত্তীকরণ কিছুতেই হতে পারে না। অবশ্য দাসসুলভ অনুকরণ হতেই পারে যেমন ইতিমধ্যে হয়েছেও।" একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সময় রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদের আতিশয্য কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক ছিল। পরাধীন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তিনি গুরুত্ব দেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বামী বিবেকানন্দ যদিও রাজনীতির জগৎ থেকে দূরত্ব রক্ষা করেছিলেন, তবুও ১৯০১ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকায় মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি বলেছিলেন যে ভারতকে সর্বাগ্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে কারণ পরাধীন জাতিকে বিশ্বদরবারে কোনো জাতি মর্যাদা দেবে না। নির্মোহ বিচার করলে বলতেই হবে যে কবিগুরুর তুলনায় স্বামীজীর দুরদৃষ্টি অনেক প্রখর ছিল যদিও পরে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। স্বামীজীও আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটি বাদ দিয়ে নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই পর্যায়ে সুভাষচন্দ্রের অবস্থানও রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মেরুতেই ছিল। ১৯২৫ সালের ১ আগষ্ট শরৎচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'Shallow Internationalism'–এর সমালোচনা করেন, যা হয়তো কিঞ্চিৎ তীব্র ছিল কিন্তু সে সময়কার পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জার্তিকতাবাদের গ্রহণযোগ্যতা সত্যিই প্রশ্নাতীত ছিল না।

বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব সৃষ্টি হয় তাঁর দুটি উপন্যাস 'চার অধ্যায়'

'ঘরে-বাইরে'কে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তার সবটুকুই অযৌক্তিক নয়। হেমচন্দ্র বলেছেন যে সে সময় পুলিশ ইচ্ছা করে কারারুদ্ধ বিপ্লবীদের উপরোক্ত উপন্যাস দুটি পড়তে দিত কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' তখন রাজদ্রোহিতার অপরাধে নিষিদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী আন্দোলনের উজ্বল দিকটা ধরা পড়ে নি, হেমচন্দ্রের এ অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপের মতো লম্পটের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমূল্যর মতো আদর্শবাদী বিপ্লবীর চিত্রও এঁকেছেন। আসলে এই সময় এক অতি উচ্চ বিশ্বমানবিকতার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল এবং তার সঙ্গে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ও বিপ্লবী আন্দোলনের কোনোটিকেই মেলাতে পারেন নি। এই জন্যই রাজনীতির জগৎ থেকে তিনি সরে গেছেন অনেক দূরে

কিন্তু বারে বারে রাজনীতির জগৎ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তিনি তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেন নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির জগতের দূরের মানুষ ছিলেন? এখানে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক জগতের এক আশ্চর্য আপাতবিরোধী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় যাকে পরিভাষায় বলা যায়—'The greatest paradox in the life of the poet.'

২. কবি জীবনের বৃহত্তম আপাতবিরোধী প্রহেলিকা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সময় ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মতভেদ হয়, তখনও কিন্তু চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে তাঁরা পরস্পরের মনোভাবকেই ব্যক্ত করেছেন, যদিও সচেতনভাবে নয়। অনেকটা অবচেতন পরিপূরকের ভূমিকায় এই সময় উভয়পক্ষকেই আমরা অবতীর্ণ হতে দেখি এবং এই আপাতবিরোধী সাযুয্যের পরিপেক্ষিতে তাঁদের এই পর্যায়ের সম্পর্ককে পুরোপুরি সংঘাতমূলক বলা যাবে না। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কবিমানসে উদ্‌ভাসিত বৃহত্তর আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শকে নিজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। মানবমুক্তির প্রশ্নটিকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি যদিও ভারতের পরাধীনতার জন্য দেশমুক্তির প্রশ্নটিকে তাঁদের অগ্রাধিকার দিতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন যখন বলেন, 'Each nationality constitutes a particular stream of the great unity, but no nation can fulfil itself unless and until it becomes itself and at the same time realizes its identity with humanity' তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি করেন। Great Asiatic Federation of the Oppressed Nationalities in Asia-র যে স্বপ্ন চিত্তরঞ্জনকে বিভোর করেছিল, তা কি রবীন্দ্রনাথেরও আজন্মলালিত স্বপ্ন নয়? অজিতকুমার চক্রবর্তী এই সময়ে 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার (১৩২৪) চিত্তরঞ্জনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে লেখেন যে প্রাদেশিক সম্মিলনীর বক্তৃতায় আদ্যোপান্ত চিত্তরঞ্জন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা গ্রহণ করেছেন।

একই যুক্তি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে সুভাষচন্দ্র, যিনি রবীন্দ্রনাথের